ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1140-1146
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.114

দেবব্রত দেবের গল্প: বহুমাত্রিকতার অন্য স্বর

সায়ন মণ্ডল, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 05.05.2025; Accepted: 14.05.2025; Available online: 31.05.2025

Abstract

Debabrata Deb is a distinguished writer of Bengali literature. He is primarily a storyteller, focusing on short stories and novels. His stories highlight the economic and political issues of Tripura, along with the lives and livelihoods of its inhabitants. Along with the themes of his short stories, the narrative style, choice of words, and sentence construction are significant aspects. These elements effectively bring his short stories to life. The Ground reality of Tripura people depicts in Bengali literature of Tripura. This scenario is different from Bengali literature of West Bengal and Bangladesh or which is called mainstream Bengali literature. Several complex historical and socio-political issues are deeply intertwined with the history of Bengalis in the state of Tripura- such as the refugee crisis, the Partition of India, migration, and identity conflicts. These developments brought about significant social, cultural, and demographic upheaval in the region. The impact of these issues is not only evident in the historical landscape of Tripura but also finds powerful expression in its literary narratives. In this context, the stories of Debabrata Deb vividly portray these turbulent times, capturing the emotional and existential struggles of displaced communities and reflecting the broader socio-political shifts in Tripura's evolving identity.

Keywords: Tripura, Short stories, Debabrata Deb, Partition, Livelihood, Crisis, Identity, Border, Land

উনিশ শতকে আধুনিক বাংলা গদ্য সাহিত্য যখন সাবালক হয়ে উঠছে, তখন বাংলা গদ্য সাহিত্য রচনার পরিসীমাটা ঠিক কতটা ছিল? এই কথা বলার কারণ এই একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে দাঁড়িয়েও আমরা দেখব বাংলা সাহিত্যের রাজত্ব কতকটা শাসিত হয় মহানগর কলকাতাকে কেন্দ্র করে। অথচ বাংলাসাহিত্য রচনার পরিসীমাকে যদি সঠিক পরিমাপে মাপতে যায় কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ এমনকি বাংলাদেশ রাষ্ট্র ছাড়িয়েও তার পরিসীমা বাড়তে থাকবে। এর কারণ অবশ্য আছে, এবং এর একটি বড় কারণ বোধহয় দেশভাগ ও ১৯৭১- এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। একটু মোটা দাগে চিহ্নিত করণ করলে এমনটাই করা যায়। কেননা এই দুটি কারণে বাঙালির ছড়িয়ে পড়া ও বাঙালি জীবনে সংকট ভীষণভাবে দেখা দিয়েছিল। বর্তমান প্রবন্ধে এই ইতিহাস বর্ণনার কিঞ্চিত প্রয়োজন আছে। কেননা এই প্রবন্ধের বিষয় গল্পকার দেবব্রত দেবের গল্প, তিনি উত্তর-পূর্ব ভারতের ‘সেভেন সিস্টার্স’ চিহ্নিত রাজ্য ত্রিপুরার অধিবাসী। সুতরাং তাঁর গল্পের আলোচনায় তাঁর

যাপন ভূমির ইতিহাসের অবতারণা প্রয়োজন। ত্রিপুরার অবস্থান বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চট্টগ্রামের পাশেই, অর্থাৎ অবিভক্ত বাংলার সঙ্গে ত্রিপুরার সংযোগ কতটা ছিল আমরা অনুমান করতে পারি সহজেই। এছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যের শেষ মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের রবীন্দ্রনাথ প্রীতি সর্বজনবিদিত, এছাড়া তিনিই বোধহয় প্রথম রাজা যিনি দেশবিভাগের উদ্বাস্তু বাঙালির জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেন।[১] ইতিহাস পাঠে আমরা জানতে পারি দেশবিভাগ ও **১৯৭১**- এর মুক্তিযুদ্ধের সময় ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় ছয় লক্ষ বাঙালি উদ্বাস্তু, শরনার্থী মানুষের সমাগম ঘটে। জানা যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে ত্রিপুরার অধিবাসীর তুলনায় শরনার্থীর সংখ্যা বেশি ছিল।[২] সুতরাং এই রাজনৈতিক, সামাজিক দুই দিক থেকেই ত্রিপুরার ভূমিতে সংকট দেখা গেছে বারংবার। গল্পকার দেবব্রত দেবের গল্পে সামাজিক থেকে রাষ্ট্রনৈতিক সংকট সবকিছুই উঠে এসেছে, ক্রমান্বয়ে বিষয়গুলি আলোচনা করবো।

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান সংস্থাপনের জন্য মানুষ একটি নির্দিষ্ট জীবিকার প্রয়োজন অনুভব করেছিল সভ্য হওয়ার সঙ্গে। স্বাভাবিক চাহিদা পূরণ করা বা বেঁচে থাকা মানুষের যখন লক্ষ্য, তখন বেঁচে থাকার রসদ আপনা- আপনি আসে না এই সত্য। এই উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করে নিয়েছে বিচিত্র জীবিকার। গল্পকার দেবব্রত দেব দুটি কাহিনি নির্মাণ করেছেন এমনই এক বিচিত্র জীবিকাকে কেন্দ্র করে, যদিও কাহিনি শুধু যে একটি জীবিকার পরিচয় দেয় এমন নয়। সে কাহিনিতে প্রবেশের পরের কথা। যাইহোক গল্পদুটি যথাক্রমে ‘বিবাদ ভূমি’ ও ‘প্রত্যন্ত’।

আমরা প্রথমেই নজর দেব ‘বিবাদ ভূমি’ গল্পটির দিকে। কাহিনিতে প্রবেশের পূর্বে পাঠকের অবশ্যই উচিত নামকরণটি লক্ষ্য করা, অভিধান বলছে বিবাদ শব্দের অর্থ ঝগড়া, কলহ প্রভৃতি। সুতরাং এমন একটা কল্পনা করা যেতে পারে যে ভূমিখণ্ড কলহের সৃষ্টি করে বা যে ভূমিখণ্ডে কলহ প্রধান সেই ভূমিখণ্ডের কাহিনি এটি। আসলে ভূমির একটি পরিচয় তৈরি করে দেয় রাষ্ট্রযন্ত্র, সেই পরিচয়ে চিনে নেওয়া যায় তাকে। কিন্তু সেই ভূমির মানুষের পরিচয় নির্ধারণ কে করতে পারে? এই কাহিনির চরিত্রগুলি এমনই এক ভূখণ্ডের জনতা যে ভূখণ্ডকে কোনও রাষ্ট্র করায়ত্ত করেনি অথবা করতে পারেনি। অর্থাৎ এই ভূখণ্ডের মানুষও কোনও রাষ্ট্রের অধিকারে পড়বে না। গল্পের চরিত্র ‘দাদ্দু’ তাই অন্য সবাইকে মনে করিয়ে দিতে বলে—

> “এখানে তেমন কোন সম্পর্ক নেই যা ধুলে হাসি হয়, কান্না হয়, ক্ষোভ হয়, ভক্তি হয়, প্রেম হয়, পরিণতি হয়। এসবের কিছুই নেই এখানে।এটা, কোন দেশ না, শহর না, গ্রাম না, পাড়া না, আমরা সুমারিবর্জিত। শুধু আদম। বেঁচে থাকাই আমাদের একমাত্র পরিণতি।একমাত্র হাসি, কান্না,ক্ষোভ, সংশয়, ক্রোধ,প্রেম—এসবের আকর। বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনটাই অমোঘ।”[৩]

ভয়ঙ্কর পরিচয় জ্ঞাপনে শিহরিত হয়ে উঠবে পাঠক। এমনই এক জনগোষ্ঠী, তাঁদের বেঁচে থাকার জীবন সংগ্রাম, জীবিকা এই গল্পের প্রতিপাদ্য।

চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই গল্পের কাহিনিতে প্রবেশ করলে আমরা প্রথমেই দেখি এই জনগোষ্ঠীর নেতা এক বৃদ্ধ, গল্পের ভাষায়—

> “...যে এই লোকটা যে সত্তরের ওপাশে গড়ানো কিন্তু থু-থু যার এখনও প্রচুর মজবুত তার কথাই এখানে আইন,”[৪]

সেই বৃদ্ধ একটি পাথরের চাঁইয়ের উপর বসে ট্রানজিস্টারে কিছু শোনার চেষ্টা করছে এবং গোষ্ঠীর জনসংখ্যার খোঁজ নিচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায় গোষ্ঠীর জনসংখ্যার একজন কমে গেছে, কারণ গত রাতে গোষ্ঠীর ‘হারাণ’ নামক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে রাত পাহারাদারের প্রহারে। ক্রমে পাঠক জানতে পারে এই মৃত্যুর

জন্য হারাণ মরে গিয়ে গোষ্ঠীর কাছে হয়ে উঠেছে 'চার পাত্তি'। এই গোষ্ঠীর মানুষের কাছে মৃত্যু আসলে শোক নিয়ে আসে না, গোষ্ঠীর কারও মৃত্যু হলে গোষ্ঠী নেতা খোঁজ নেন গোষ্ঠীর নারীরা কয়জন অন্তঃসত্ত্বা আছে, কয়জন রজঃস্বলা আছে। অর্থাৎ শুধু শূন্যস্থান পূরণ, সমতা বজায় রাখা। এমনকি যৌনমিলন, কার গর্ভে কার সন্তান জন্মাছে সমাজের এই নিয়মের মধ্যেও পরে না তাদের জীবন। গোষ্ঠীর কেউ মারা গেলে গোষ্ঠীর মানুষ তাকে লবণ দিয়ে মাটির গর্ভে শুইয়ে দিয়ে আসবে এবং একমাস পর মাটি খুঁড়ে কঙ্কাল তুলে এনে বেচে দেবে চার পাত্তির বিনিময়ে। এই গোষ্ঠীর এই একটি বিচিত্র জীবিকা। কাহিনিতে এটিও উল্লেখ থাকে যে, যেহেতু তারা কোনও রাষ্ট্রের নাগরিক নয়, সেহেতু তাদের মৃতদেহের উপর রাষ্ট্রের কোনও অধিকার নেই। যতদিন তারা বেঁচে আছে তারা হারান, সুবল অথবা দুলাল কিন্তু মৃত্যু ঘটলে শোক পালনের পরিবর্তে গোষ্ঠীর বাকিদের কাছে তারা হয়ে ওঠে তিনপাত্তি, চার পাত্তি। গোষ্ঠী নেতা দাদ্দু বলে—

> "বিবাদ-ভূমির মানুষ তুমি,একথা প্রাণপনে মনে রাখতে রাখতেই তোমার মৃত্যু ঘটবে টেম। তখন সোয়াসের লবণের পাহারায়,একটি মাস তোমাকে রাখা হবে।তুমি হবে তিনপাত্তি।এই বিবাদ-ভূমির এপাশ-ওপাশ যে কোন পাশ থেকেই তোমার খরিদ্দার আসতে পারে। তোমার যত্নে বয়ন করা দুঃখমালা কেউ দর দিয়ে, দরদ দিয়ে কিনবে না- কিনবে তোমার চৌষট্টি-তন্ত্র সার।"[৫]

নো ম্যানস ল্যাণ্ডের মানুষদের জীবনের এক ভয়ঙ্কর বাস্তবতার ছবি এটা।

শুধু এটুকুই নয় এই গল্পের সংলাপের ছত্রে ছত্রে শিষ্ট অথচ শানিত বাক্যবাণ সবসময় সজাগ রাখে পাঠককে কাহিনির পটভূমি ও চরিত্রদের অবস্থান সম্পর্কে,

> "এই দেশ-বর্জ্য সংহতির মূল কথাই হল ঐক্য। ঐক্যই জনবল ধরে রাখতে পারে। এই সত্য দেশ বা জাতি হলে মনে রাখতে হয় না। কিন্তু বিবাদ-ভূমির বাসিন্দারা, ঐ একটি কথাই মনে রাখে। ফলে, কোন মেয়েছেলের গর্ভে কার সন্তান জন্মাল সে খবর এখানে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবার মতন একটি বস্তু ছাড়া কিছু না। এখানকার আদমেরা শুধু একটা কথাই জানে জন্ম-ঘর ফাঁকা ফেলে রাখা এক সুতীব্র গুনাহ।"[৬]

অথবা রাষ্ট্র-রাষ্ট্র খেলার হাতিয়ার হয়ে ওঠে যখন জনগোষ্ঠী বা রাষ্ট্র যখন ব্যবহার করে তাদের বাঁধ নির্মাণে বা ধ্বংসে। তারা সবকিছু জেনেও শুধুমাত্র বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহের জন্য কাজ করে যায় নিষ্ঠার সঙ্গেতাঁদের নিষ্ঠায় এতটুকু ফাঁক তারা রাখে না, নিজেদের সৃষ্টি ভাঙার বরাত যখন তারাই পেয়ে যায় তখন দৃঢ় কণ্ঠে বলতে শুনি—

> "না, যখন গড়ি তখন গড়ার গর্ব খর্ব করি না আমরা। ভাঙার সময়ও তাই। আমাদের হাতুড়ি হাতির থেকেও শক্তি ধরে তখন। কারণ, আমরা তোমাদের মতো দেশজ নই। দেশজ'র মতো আমরা পরস্পরের হন্তারক না, আমরা জীবনের জন্যেই বিধ্বংসে বিশ্বাস করি। তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিবাদের বশে নির্জ্ঞানকে ধ্বংস করি না।"[৭]

এই গল্পে গল্পকারের শিষ্ট, শানিত বাক্যবাণ লক্ষ্য করার মতো। শুধু প্রান্তসীমার একটি গোষ্ঠীর জীবন সংগ্রামের কাহিনি এই গল্প নয়। রাষ্ট্র, রাজনীতির রূঢ় বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনের আদিম দিকগুলিও সুচারুভাবে কাহিনিতে নির্মাণ করেন লেখক। শুধুমাত্র ভাবিত হওয়ার কোমলতার স্তর নয়, তীব্র সচেতনতা আছে এই গল্পের ভিতর।

'বিবাদ ভূমি' গল্পে আমরা যে জীবিকার কথা পাই 'প্রত্যন্ত' নামক গল্পেও গল্পকার একইরকম জীবিকার কথা বলেন। কাহিনির কিছু ভিন্নতা থাকলেও 'প্রত্যন্ত' নামক গল্পেও বেঁচে থাকার সংগ্রামের চিত্র পাই। এই গল্পের পটভূমি 'বিবাদ ভূমি' গল্পের পটভূমির কাছাকাছি, নো ম্যানস ল্যান্ড, বর্ডার এলাকার কাছ থেকে আমরা এসে পড়ি শহর প্রান্তের রিফিউজি কলোনিতে, বর্ডারের কাছেই। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র নটু, তার সঙ্গে রয়েছে আবু, দিলুপ্রভৃতিরা। তাদের জীবিকা লাশ পচিয়ে বা মাটির গর্ভ থেকে বেআইনি ভাবে গলিত শব তুলে এনে তার কঙ্কাল বর্ডারের ওপাশে চালান করা। এই কাজে তাদের আড়কাঠি আছে শিবু হোমগার্ড, যে সন্ধান দেয় এবং জামাল যে কঙ্কাল কিনে বর্ডার পার করে নিয়ে যায়। কাহিনিতে পাঠক প্রবেশ করে, জানতে এই রিফিউজি কলোনির বাসিন্দারা নিতান্ত পেটের দায়ে অর্থাৎ সেই বেঁচে থাকার তাগিদে এই বেআইনি বা পৈশাচিক কর্মকাণ্ড যুক্ত হয়েছে। কাহিনি এক রিফিউজি কলোনির মানুষদের প্রত্যন্ত জীবন নিয়ে। শুধু কঙ্কাল পাচারের জীবিকায় নয়, নিজের শরীরের রক্ত বেচে পেট চালানোর কথাও শুনতে পাওয়া যায় গল্পে। যাইহোক ভিন্ন ভিন্ন সময় বর্ডার পেরিয়ে রিফিউজি হয়ে ওঠা নটু, আবু, দিলুরা জড়িয়ে পড়ে 'খাঁচা পাচারের' কাজে, অর্থাৎ শব দেহকে লবণ চাপা দিয়ে রেখে পরবর্তীতে তা থেকে আঁশ-মাংশ ছাড়িয়ে কঙ্কাল বের করে চালান দেওয়া। প্রথম ভয়ে ভয়ে শুরু করলেও ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে ওঠে নটুর দল। আড়কাঠি শিবু ও পাচারকারী জামালের সাহায্যে ক্রমশ তারা কড়কড়ে নোটে অর্থাৎ বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। কাহিনি ক্রমে দেখি একসময় শিবু হোমগার্ডের বিশ্বাসঘাতকতায় ধরা পড়তে পড়তে কোনওক্রমে বেঁচে যায় নটুর দল, অথচ তারা টের পেয়েছিল তাদের এই কর্মকাণ্ডের ভাগ হাসপাতাল,বিএসএফ সকলেই অংশীদার, কঙ্কালের চোরাচালানে সকলেই লভ্যাংশ নিয়ে থাকে। যে রাতে শিবুর বিশ্বাসঘাতকতায় বিপর্যস্ত হয়ে নটুর দল সে রাতে ঘরে ফেরার মুখে তারা জানতে পারে নটুর বৃদ্ধ বাবা মারা গেছে। এখানেই দেখি গল্পের চমক, ঘরে ফেরার মুখে নটু ও তার দুই সঙ্গী আবু ও দিলু নটুর বাবার মৃত্যু খবর পেয়ে লাশের অধিকার দাবি করে। অর্থাৎ, নটুর বাবার শব পচিয়ে কঙ্কাল পাচার করার কথা বলে। শোকে বিহ্বল নটু আক্রোশে জ্বলে ওঠে। কিন্তু সঙ্গী আবু মনে করিয়ে দেয়— "পকেট খাইল্যা রে নটুদা। পেট কাইল্যা..."[৮] হঠাৎ যেন আবেগ, বিহ্বলতা ছাপিয়ে নটুর কাছে প্রকট হয়ে বাস্তব। নটু রাজি হয়ে যায় আবু, দিলুর প্রস্তাবে। নিজের বাবার শব পচিয়ে কঙ্কাল পাচার করতে।

এই গল্পেও গল্পকার দেখান বর্ডার এলাকার রিফিউজি মানুষের অসহায় অবস্থা,তাদের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের রূঢ় বাস্তবতা।কীভাবে রক্ত বেচে, নিজের পিতার কঙ্কাল পাচার করে রসদ সংগ্রহ করে মানুষ।বর্ডার এলাকার রাজনীতি, প্রশাসনিক ব্যবস্থাও এই গল্পে স্পষ্ট।

গল্পকার দেবব্রত দেবের একটি গুরুত্বপূর্ণ গল্প 'বংশলতিকা', এটি তাঁর 'পিতৃঋণ' গল্প গ্রন্থের অন্তর্গত। আমরা যারা প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলানাপোতা আবিষ্কার' পড়েছি তারা 'বংশলতিকা' গল্পের ভাববাচ্যে কথন সহজেই ধরতে পারবো বা প্রেমেন্দ্র মিত্রের উক্ত গল্পকে মনে করাবে। 'বংশলতিকা' গল্পটি পাঠ করতে গিয়ে দ্বিতীয়ত যে বিষয়টি আগ্রহ বাড়িয়ে দেয় সেটি এই গল্পটির কাব্যিক গদ্য, উদাহরণ হিসেবে উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে এরকম—

> "এইভাবে শরৎকাল একসময় পার হয়ে যাবে। আরও এক শরৎ। সূর্যের গনগনানি কমবে একটু একটু করে। নদীর জলে আকাশের লাজুক লাজুক ছায়া, টুকরো টুকরো সাদা মেঘের ভাসাভাসির ছবি খেলা করতে শুরু করবে।"[৯]

বা,

> "ওই গাছগুলোর সামনে বসলে মনে হত- যা হয়েছে এখন পর্যন্ত সবই তো স্বাভাবিক। স্বাভাবিক না- হলে ওই গাছেরা কি সুন্দর একদিকে সব শাখা- প্রশাখা পত্র পল্লব উড়িয়ে বেশ আছে তো- কী করে থাকে। অন্য গাছেদের মতই মাটি থেকে জল, খাদ্য, মাটির গভীরে শিকড়, ছাল- বাকল, নাইট্রোজেন- সবই নিয়ে দাঁড়িয়ে- গাছের মতো উদাস অনন্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াহীন প্রাকৃতিক নিয়ম- কানুনের মধ্যে ঠিক যেমনটি তার অবস্থান হওয়া উচিত..."[১০]

উক্ত উদ্ধৃতিগুলির বিষয়ভিত্তিক ব্যঞ্জনা আছে, তার সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত কাব্যিক ব্যঞ্জনা রচনা করে। এই গল্পের কহিনি বা বিষয়বস্তুতে যাওয়ার পূর্বে গঠন সম্পর্কে আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন। এই গল্পের কাহিনির চলন ঠিক সোজাসাপ্টা বা ঘটনার পরম্পরা ঠিক সরল নয়। গল্পটি শুরু হয় গল্পের মূল চরিত্র নিবারণ রায়ের চিঠি লেখা নিয়ে এরপর ধীরে ধীরে কখনও বর্তমান, কখনও ইতিহাস বা অতীতে কাহিনির ঘোরাফেরা এবং এই সূত্রগুলিকে যথাযথ বয়ন করেন গল্পকার।

গল্পের কাহিনি মোটামুটি নিবারণ রায়কে নিয়ে, পূর্বে উল্লেখ করেছি গল্প শুরু হচ্ছে নিবারণ রায়ের তার পুত্রদের চিঠি লেখার মধ্যে দিয়ে। গল্পে অহেতুক চরিত্রের বাড়াবাড়ি নেই, এমনকি গল্পকার নিজে সূত্রধারের মতো গল্পে প্রবেশ করে সে কথা বলেও যাচ্ছেন। কাহিনিতে প্রথমে আমরা দেখি নিবারণ রায় চিঠি লিখছেন তাঁর তিন ছেলেকে, তিনটে চিঠির বয়ান একই, শুধু গন্তব্য ভিন্ন। সেই চিঠিতে বর্তমান এক পরিস্থিতির উল্লেখ, সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারার মতো বৈষয়িক বিষয়ের কথা এবং একটি বংশলতিকা নির্মাণের কথা বলা হচ্ছে। এরপরেই গল্পকার আমাদের নিয়ে চলেন অতীতে, তবে এই অতীত একেবারে ইতিহাস নয়, প্রথম অধ্যায়ের এই ইতিহাস নিবারণ রায়ের 'নিবারণ রায়' হয়ে ওঠার ও পটভূমিতে প্রতিষ্ঠা করার কাহিনি। পাঠক জানতে পারেন অরুণাচল প্রদেশের কোনও এক অরণ্য প্রদেশে গিয়ে নিবারণ রায়ের ভাগ্যে পরিবর্তন ঘটে, সেখানে উপজাতীয় এক অরণ্য কন্যাকে বিবাহ করেন এবং সেই স্ত্রীর সম্পত্তিই তার ভাগ্য পরিবর্তনের কারণ। এরপর দীর্ঘ বর্ণনায় রয়েছে কীভাবে অরুণাচল প্রদেশ থেকে স্ত্রীর মৃত্যুর পর শহরে চলে আসা, রায় পদবী গ্রহণ, স্থানীয় এক ক্লাবকে খয়রাতি টাকা দিয়ে পিতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে পাঠাগার নির্মাণ এবং এই সূত্র ধরেই রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট প্রভৃতি করে নেওয়া। অর্থাৎ বোঝা যায় অরুণাচল প্রদেশ থেকে শিকড়হীন নিবারণ ক্রমে অর্থের জোরে গল্পের পটভূমিতে শিকড় ছড়িয়ে দিয়ে ক্রমে ক্রমে হয়ে ওঠেন 'নিবারণ রায়'। গল্পের এই প্রথম অধ্যায়েই ময়না নামে এক বালিকা ও তার মা সুনীতির সঙ্গে নিবারণ রায়ের একটি সম্পর্কের কথা বলেন, এই সূত্র স্মরণ করা উচিত পুত্রদের কাছে পাঠানো চিঠিতে নিবারণ রায় স্বয়ং উল্লেখ করছেন এদের কথা—

> "...তাঁতিপাড়ার অমূল্য, যে আমাদিগকে বিভিন্ন সময় জন-খাটিয়া, গরু দোহাইয়া, মজুরী করিয়া উপকৃত করিয়াছে তাহার গতে তাহার বউ সুনীতি এবং কন্যা ময়না আমার সঙ্গে রহিয়াছে। ময়নাকে তোমরা নিজের ভগিনী হিসেবে গণ্য করিতে পার (না-ও পার)।"[১১]

অর্থাৎ কিনা ময়না ও তার মাকে বংশলতিকায় স্থান দেওয়ার একটি প্রবণতা দেখা যায়। আরেকটু সচেতন হওয়া প্রয়োজন এই কারণে নিবারণ রায়ের এই বক্তব্যের মধ্যে তার শিকড় বিস্তারের ইচ্ছেটা প্রকাশ পাচ্ছে।

এরপর চলে আসতে হয় গল্পের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। এই পরিচ্ছেদ নিবারণ রায়ের মুখ দিয়ে ব্যক্ত হয় তার সুদূর ব্যক্তিগত ইতিহাস।এই পরিচ্ছেদে এসে পাঠক জানতে পারে মাইজা রায়ের (নিবারণ রায়ের উপজাতি পত্নী) সঙ্গে নিবারণ রায়ের বিবাহ সংক্রান্ত ঘটনাবলি, তার তিন সন্তানের জন্মবৃত্তান্ত, সম্পত্তি প্রাপ্তি এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ নিবারণ রায়ের জন্ম ইতিহাস। নিবারণ রায় যে অনাথ, এক ধর্ষিতা ষোড়শী জননীর

সন্তান সেই সব ইতিহাস এই পরিচ্ছেদে নিবারণ রায় নিজেই ব্যক্ত করেন। কীভাবে জন্মের পর থেকেই শিকড়হীন হয়ে ঘুরতে ঘুরতে থিতু হওয়ার চেষ্টা করেছেন বা বলা ভাল শিকড়ের সন্ধান করেছেন সেটা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পরিষ্কার হয়। এটাও বোঝা যায় নিবারণ রায় কেন বংশলতিকা নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন।পৃথিবীর বুকে যেন নিজের চিহ্ন রেখে যেতে চাইছেন। নিবারণ রায় বলেন,

> "অনেকের মত আমার মা ওই নিকেতনে- তখন হয়ত নাম ছিল রিলিফ ক্যাম্প- সতেরোতে প্রবেশের দ্বারে পৃথিবীর বুকে আমার যাত্রাপথের সূচনা করে দিয়ে গিয়েছিলেন।"[১২]

গল্পকার নিজের যাপন ভূমির সমস্যা, সমসাময়িক বিষয় বস্তু স্বাভাবিক এড়িয়ে যেতে পারেন না। কখনও সরাসরি কখনও বা কাহিনির মধ্যে বিচ্ছিন্ন ভাবে এসে পড়ে। দেবব্রত দেবের গল্পের আলোচনায় যে গল্পের উল্লেখ প্রয়োজনীয় তার মধ্যে অন্যতম 'বিবর্জিত উপকথা' ও 'শনাক্ত' গল্প দুটি। গল্প দুটির পাঠে আমরা বুঝতে পারি পটভূমি লেখকের যাপন ভূমি ত্রিপুরা এবং গল্পের সামাজিক সমস্যা ওই ভূমির সঙ্গে সন্নিবেশিত। বিষয়গত ভাবে গল্পদুটির বৈসাদৃশ্য আছে একথা প্রথমে স্বীকার করে নিতেই হয়। প্রথমটির মধ্যে যে ইতিহাস বা সমস্যার সন্ধান পাওয়া যায় সেটা সমাজ থেকে ব্যক্তির মধ্যে দিয়ে পরিণতি পেয়েছে। দ্বিতীয়টির কাহিনি অনেকটাই ব্যক্তি কেন্দ্রিক।

যাইহোক 'বিবর্জিত উপকথা' গল্পটি সাতটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। গল্পটির কেন্দ্রে রয়েছে বিন্দুলক্ষ্মী, অভিরামও শরদিন্দু। এখানে অভিরাম রিয়াং ও তার স্ত্রী বিন্দুলক্ষ্মী উপজাতি ভুক্ত, অপরদিকে শরদিন্দু বাঙালি। শরদিন্দু ও অভিরামের মধ্যে আবাল্য বন্ধুত্ব, পড়াশোনা থেকে শুরু করে রাজনীতি সবকিছুতেই অভিরামের সঙ্গী বন্ধু ভ্রাতৃপ্রতীম শরদিন্দু। তাদের বন্ধুত্ব আসলে একটি সম্প্রতি সৌহার্দ্যের প্রতীক। তাদের দুইজনের মধ্যে সম্পর্ক এতটাই কাছের যে শরদিন্দুর মা কিম্বা বিন্দুলক্ষ্মী সকলেই সহোদর ভাবতে দ্বিধা করে না। বিন্দুলক্ষ্মীর চিন্তায় কাহিনিতে উঠে আসে—

> "হাঁটতে হাঁটতে হাসি পেল বিন্দুলক্ষ্মীর যা-সব মজা করে শরদিন্দু। তা দেওর বলতে তো ওই একজনই। আর কে-ই বা করবে।"[১৩]

অথচ কাহিনির মধ্যে প্রবেশ করে আমরা বুঝতে পারি সমাজের স্তরে স্তরে লুকিয়ে রাখা আছে বিদ্বেষের বিষ, জাতিগতভাবে চিনিয়ে দিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করার প্রবণতা। কখনও বাঙালি বিদ্বেষ, কখনও উপজাতি বিদ্বেষ। পড়াশোনায় শরদিন্দুর থেকে কিঞ্চিত পিছিয়ে থাকা সত্ত্বেও অভিরামের চাকরি পেয়ে যাওয়ার কারণ হিসাবে অভিরামের 'রিয়াং' উপজাতি হওয়াকে দেখে। অপরদিকে উদ্বাস্তু হিসাবে বাঙালির 'ঘরবৃদ্ধি' বা জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে ভালভাবে নেয় না উপজাতি সমাজ। ক্রমান্বয়ে কাহিনিতে নেমে আসে সংকট, বিন্দুলক্ষ্মী ধর্ষিত হয়, এই ঘটনা যেন আরও বেশি করে বিভাজনকে স্পষ্ট করে। কাহিনির শেষে বাস্তু ছেড়ে চলে যাওয়া অভিরামের পরিবারের চলে যাওয়া আটকাতে পারে না আবাল্য বন্ধু শরদিন্দু। অথবা চেষ্টাও করে না, তার ভিতরের দ্বিধা ক্রমশ পর্যবসিত হয় হতাশায়। বাস্তব সংকট এভাবেই গল্পে তুলে আনেন গল্পকার।

অপরদিকে 'শনাক্ত' গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে বর্তমান পুলিশের ওসি বীরেশ্বর দাশগুপ্ত, তার অতীত স্মৃতির কোলাজ ও বর্তমান অবস্থান নিয়েই এই গল্প। বীরেশ্বরের স্মৃতি বারবার আসে যৌবনের রাজনীতির স্মৃতি, বন্ধুত্ব প্রভৃতি। অথচ বর্তমান অবস্থানে সে যেন সেই অতীতকে স্বীকার করতে চায় না। বর্তমান পেশার উচিত-অনুচিতের দ্বন্দ্বে ভোগে সে। মুক্ত দুনিয়ার স্বপ্ন দেখা বীরেশ্বর এখন পেশাগত কারণে নিজের বিবেককে আচ্ছন্ন করে রাখে। আসলে দুই অস্তিত্বের শনাক্তকরণ এই গল্পের মূল প্রতিপাদ্য।

কোনও গল্পকারের সমগ্র গল্পের মধ্যে বিষয়গত মিল খুবই কমই থাকে কিন্তু লেখনীর বিশিষ্টতার কারণে লেখক নামহীন গল্পকেও চিনে নেওয়া। দেবব্রত দেবের গল্পগুলিও নিজস্ব বিশিষ্টতায় সমুজ্জ্বল। গল্পকারের গল্পে যে বিষয়গুলি লক্ষণীয় তার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে বলিষ্ঠ সংলাপ ও বাক্যের গঠন। 'বিবাদ ভূমি' গল্পের সংলাপ পূর্বেই উল্লেখ করেছি, পরিবেশ, চরিত্র অনুযায়ী কখনও কখনও সংলাপ বেমানান মনে হলেও, সংলাপের বলিষ্ঠতা, শাণিত ভঙ্গি পাঠকের ভাবনার জগতে কষাঘাত করে। এই ধরনের বাক্য বাংলা ছোটগল্পের বিস্তৃত পটভূমিতে কমই চোখে পড়ে। এর সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ করতে গল্পের কথনরীতির ভিন্নতার কথাও। 'বংশলতিকা'- র ভাববাচ্যের রীতির থেকে 'বিবর্জিত উপকথা' কথন রীতির পার্থক্য শুধু চোখেই পড়ে না, যথাযথ মনে হয়। এছাড়াও উল্লেখ করতে হয় গল্পকার যেভাবে যাপনভূমির বিভিন্ন সমস্যা, রাজনৈতিক খেলা, রাষ্ট্রযন্ত্রের কলে মানবিকতার হত্যা প্রভৃতি বিষয়গুলি। এসব কারণেই দেবব্রত দেবের ছোটগল্প শুধু ত্রিপুরার সাহিত্যে নয় সমগ্র বাংলা সাহিত্য জগতে উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

তথ্যসূত্র:

১. চক্রবর্তী, বিমল(সম্পা), দেশ ভাগের গল্প: ত্রিপুরা, গাঙচিল, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮, পৃষ্ঠা ৮
২. চক্রবর্তী,বিমল(সম্পা), দেশ ভাগের গল্প: ত্রিপুরা, গাঙচিল, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮, পৃষ্ঠা ৭
৩. দেব, দেবব্রত, পিতৃঋণ, অক্ষর পাবলিকেশনস, আগরতলা, জানুয়ারি ২০০৭, পৃষ্ঠা ৬৭
৪. পূর্বোক্ত,পৃষ্ঠা ৬৭
৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৮
৬. পূর্বোক্ত,পৃষ্ঠা ৭০
৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৯
৮. দেব, দেবব্রত, মাটি ও অন্যান্য গল্প, অক্ষর পাবলিকেশনস, আগরতলা, জানুয়ারি ২০০১, পৃষ্ঠা ৮০
৯. দেব, দেবব্রত, পিতৃঋণ, অক্ষর পাবলিকেশনস, আগরতলা, জানুয়ারি ২০০৭, পৃষ্ঠা ৭২
১০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭৬
১১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭৩
১২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭৮
১৩. দেব, দেবব্রত, অন্তস্থল, স্রোতপ্রকাশনা, ত্রিপুরা, মার্চ ২০০৮, পৃষ্ঠা ৫২